

" মা - - সী " !!

ফতেমোল্লা

ছুটে চলেছেন সৈয়দ। দিল্লীর তখত-এর গোপন প্রতিনিধি।

কখনো আলো, কখনো অন্ধকার। কখনো ধূলি ধূসরিত প্রান্তর, শয্যাশ্যামল বসতি, কখনো গহন বন। ভ্রক্ষেপ নেই সৈয়দের। তার উপায়ও নেই। প্রাণ হাতে করে ঘড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছেন তিনি বাংলার দিকে, সুদূর দিল্লী থেকে। শত শত মাইল পথ, কিন্তু অবকাশ নেই বিশ্রামের। কারণ, ওদিকে বাংলার দিকে রওনা হয়ে গেছে জোয়ানপুরের (জৌনপুর?) নবাবের লোকেরাও। মরণপণে ছুটছে দুই প্রবল বিরোধীপক্ষ, লক্ষ্য ওই একই — বাংলা। এই একটি মাত্র সুতোর ওপর ঝুলছে দিল্লীর মসনদের ভবিষ্যৎ, কে আগে পৌঁছয়। রূপকথা নয়। আমাদেরই পূর্বপুরুষের অসাধারণ ইতিহাস।

বিদ্রোহী জোয়ানপুরের সাথে লড়াই চলছে দিল্লীশ্বর সুলতানের। জয়-পরাজয়ের সাথে শুধু মসনদ নয়, মান-সম্মান এবং গর্দানটাও জড়িত। মরিয়া হয়ে লড়ছে জোয়ানপুরও। কিন্তু দু'দলেই এখন হতাশা আর ক্লান্তি। শুরু হবারপর চব্বিশটা বছর কেটে গেছে, যুদ্ধ চলছেই। মনে হচ্ছে না এ যুদ্ধ কোনদিন থামবে। কত আর পারা যায়। দু'দলেই হন্যে হয়ে খুঁজছে একটা আলাদীনের প্রদীপ, যা দিয়ে অবসান হবে একঘেয়ে যুদ্ধটার, বিজয়ের মধ্যে।

জ্বলে উঠল আলাদীনের প্রদীপ। বাংলায়। চমকে তাকালেন দিল্লীশ্বর। চমকে তাকালেন জোয়ানপুরের নবাব। অবিশ্বাসে উঠে দাঁড়ালেন দু'দলের সেনাপতি। পাওয়া গেছে! ওই তো, ওই তো সে! রাতের নক্ষত্রখচিত আকাশের মতো বহু বহু সামরিক প্রতিভায় ঝিকমিক সুবিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র নয়, একেবারে দোদগু মার্তও প্রতাপে জ্বলে জ্বলে উঠছে কে ও? শক্তির, সম্ভারের, সমরনীতির সমস্ত হিসেব তছনছ করে পায়ে দ'লে উঠে দাঁড়িয়েছে এ কোন বিপুল কালাপাহাড়! এ-ই তো সেই অলৌকিক! চিরবিজয়ের গবতিলক খচিত উদ্ধতললাট। যুদ্ধজয়ের জন্য একেই তো চাই! ছুটল জোয়ানপুরের দূত। ছুটলেন সৈয়দ।

বাংলার চিরকালের রাজশাহী। মান্দা এলাকা। তখনো ছিল, এখনো আছে। সেখানেই জন্মেছিল ছেলেটা। কালাচাঁদ রায়, ডাকনাম রাজু। নিষ্ঠাবান ছোটখাটো জমিদার বংশ, জাতে ব্রাহ্মণ। দাদু আর মা-মাসী মিলে কতো আদরে মানুষ করেছে বাপহারা কন্দর্পকান্তি ছেলেটাকে। বিশেষ করে মাসী। সে আদরের বুঝি তুলনা নেই। কন্দর্পকান্তি, কিন্তু তুরন্ত দুরন্ত জেদী একগুঁয়ে ছেলেটার সব দুরন্তপনার চিরনির্ভয় নির্ভর তার আদরের মাসী। চলনে বলনে গঠনে রঙে রূপে শাস্ত্রজ্ঞানে অস্ত্রশিক্ষায় অতি অসাধারণ সুকণ্ঠ সেই তরুণ বাংলার অধিপতি বুরবক শাহ-এর দরবারে চাকরি নিয়েই তরতর করে উঠে গেল ওপরে, যেখানে পৌঁছতে মানুষের লেগে যায় বহু বছর। তারপরে এল জীবনের সেই বাঁক। যেখানে ঘটনা ঘটে। টলমল করে ওঠে জীবনের পা। বিধবা মিসেস সিম্পসনকে বুকে জড়িয়ে অর্ধপৃথিবীর সিংহাসন অবহেলায় ত্যাগ করে যান সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড। সুবিশাল চীন সাম্রাজ্য পায়ে ঠেলে নামহীন পতিতাকে বুকে নিয়ে গহন গ্রামে সুখী জীবন কাটান সম্রাট শু-চি। গোপনেপ্রকাশ্যে গড়ে ওঠে লক্ষ কোটি তাজমহল দিক হতে দিগন্তরে, যুগ হতে যুগান্তরে।

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন।

www.bornosoft.com

এরই নাম প্রেম, মরণশীল তুচ্ছ মানুষের ক্ষণিকের তুচ্ছ জীবনে একফোঁটা অমৃত, অনন্তের একটু ছোঁয়া।

প্রতি সকালে মহানন্দায় স্নান সেরে "সুকণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে" ঘরে ফেরে সুদর্শন কালাচাঁদ। জানে না, ঠিক তখনি রাজপ্রাসাদের বাতায়নে, গবাক্ষে নিভুল এসে দাঁড়ায় কেউ। প্রতিদিন। "সুরলোকে বেজে ওঠে শংখ"(কবিগুরু)। দেবলোকে নৃত্যছন্দে মনোহর পেখম মেলে ধরে প্রেমদেব কার্তিকের ময়ূর। অতনুশরবিদ্ধা হন সগুদশী রাজকন্যা। খবর চলে গেল রাজা-রাণীর কানে। খুশীই হলেন তাঁরা। ছেলেটা হিন্দু বটে, কিন্তু যোগ্য হিন্দু পাত্র মুসলমান হয়ে রাজপরিবারে বিয়ে করেছে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে।

ঘটল সেটাই, যেটা আগে ঘটেনি। বিয়ের প্রস্তাবে কালাচাঁদের কৃতজ্ঞ হাসি আশা করেছিলেন রাজা। উলটে একেবারে বঙ্গেশ্বরের মুখের ওপরেই তেলে বেগুনে ফেটে পড়ল দৃঢ়চেতা জেদী কালাচাঁদ। রাজ্য, রাজকন্যার লোভ দেখিয়ে ধর্মত্যাগ! প্রশ্নই ওঠেনা। কি মনে করেছেন রাজা নিজেকে? অপমানে কালো হয়ে গেল রাজার মুখ। বাধল বিরোধ, কথায় বেড়ে গেল কথা। এদিক ওদিক থেকে সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা হল, কিন্তু না। ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু মচকাবার পাত্র নয় কালাচাঁদ। জন্মগত জেদী দৃঢ় ছেলে সে। ক্রোধে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন অপমানিত বুরবক শাহ, জনসমক্ষে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে দিলেন। ভেঙ্গে পড়ল জনতা, বিকমিক করে উঠল খড়া। প্রস্তুত হল মৃত্যুবেদী, প্রস্তুত হল ঘাতক। থমকে গেল সময়। ঠিক তখনি অন্তঃপুরের পর্দা ছুঁড়ে ফেলে হাহাকারে ছুটে এলেন রাজকন্যা, ঘাতকের খড়োর নীচে পেতে দিলেন দেহ। না, দয়িতা বেঁচে থাকতে দয়িতের দেহ স্পর্শ করতে পারবেনা কোন শক্তি।

এমনই হয়। ছেলেখেলার বস্তু নয় ভালোবাসা। জীবনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি সে। সে যেমন "জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য আর মৃত্যুকে দেয় মহিমা" (যাযাবর), তেমনি তারও একটা অধিকার আছে মানুষের ওপর। হঠাৎ কখনো সে প্রাণ পর্যন্ত দাবী করে বসে। এবং সে দাবী মেটাতে হয় মানুষকে। সাক্ষী তার শরৎচন্দ্রের দেবদাস, সাক্ষী তার ময়মনসিংহের মহুয়া, পশ্চিমের লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, হীর-রানঝা। স্তম্ভিত চেয়ে রইল কালাচাঁদ অপলক। আজীবন পালন করে আসা চির পরিচিত ধর্মটার চেয়ে অনেক বড় আরেকটা ধর্মের অনেক বড় আহ্বান তখন তার মনে বেজেছে। "ফুলশরের আঘাতে ধর্মবেদী বিদীর্ণ হইল, কালাচাঁদ বিবাহে সম্মত হইল", মুসলমান হয়ে বিয়ে হল তার।

এবং তার পরেই নিজের আশৈশব হিন্দুসমাজে অবধারিত সে হয়ে গেল মুরতাদ।

সব ধর্মের ফতোয়াবাজেরা মুরতাদের ওপরে অত্যাচারের মাত্রাটাকেই সওয়াবের মাত্রা মনে করে। ধর্মীয়-সামাজিক স্টীম-রোলারের মধ্যে পড়ে গেল সে। পরিচিত সবাই কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল এতদিনের এত সম্মানিত কালাচাঁদকে। দিশেহারা সে ছুটে গেল উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরে, ঠেলে বের করে দিল পাওয়ার। চিরজেদী কালাচাঁদ মন্দিরের দরজায় অনশন করে পড়ে রইল সাত-সাতটা দিন। কিন্তু জগৎনাথ তখনো চিরকালের মতই পণ্ডিত-পাণ্ডার কজায় বন্দী জিম্মি। অশ্রুসিক্ত অনাহারক্লিষ্ট দুর্বল কালাচাঁদকে টেনে হিঁচড়ে মন্দিরের চৌহদ্দি থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল তারা।

এবং তারপর।

শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুন মহাদস্যু রত্নাকরকে করেছিল মহর্ষি বাল্মিকী। অনাদি-অনন্তের আহ্বান বন্দুকধারী অরবিন্দকে বানিয়েছিল ঋষি অরবিন্দ। এখনে ঘটল ঠিক উলটোটা। মরে গেল, চিরকালের জন্য বুঝি হারিয়ে গেল রাজশাহীর সুদর্শন কালাচাঁদ। প্রতিশোধের রক্তক্ষু মেলে

ভয়ংকর প্রতিজ্ঞায় উঠে দাঁড়াল ভয়াবহ কালাপাহাড়। এতবড় কঠিন প্রতিজ্ঞা বুঝি কখনো করেনি কেউ। "হিন্দু" শব্দটাকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলবে সে। মূর্তি বলতে, মন্দির বলতে, পণ্ডিত-পাণ্ডা বলতে কিছু থাকবে না কোথাও। বুরবক শাহের কিছু সৈন্য নিয়ে সে বজ্র প্রথমেই ভেঙ্গে পড়ল উড়িষ্যার ওপর, জগন্নাথ মন্দিরের ওপর। মন্দির, মূর্তি, পুরহুত-পাণ্ডা, রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সবকিছু। এখনো, এই এত বছর পরেও উড়িষ্যার জনগণ বাংলার বর্গীর মত আতংকে ত্রাসে সুরণ করে কালাপাহাড়ের সে কাহিনী। কালাপাহাড়ের ওপর নজরুলের একটা কবিতার কথাও মনে পড়ে। এ নামে তারাশংকরের এক অনবদ্য ছোটগল্পও আছে পশুপ্রেমের ওপর, বিরাট দুটো মহিষের ওপর।

এরপর যে চিত্র ফুটে উঠল তা একদিকে যেমন উম্মাদ ধর্মবিকার, অন্যদিকে তেমনি শক্তির ভারসাম্যের সমস্ত হিসেব পায়ে দলে ক্রমাগত বিজয়ের অসাধারণ সামরিক প্রতিভা। হিন্দুর বিরুদ্ধে বলাহীন এক ছোট্ট সৈন্যদল আর তার অলৌকিক প্রতিভাবান সেনাপতির সে কাহিনী, ক্রুদ্ধ এক কালবৈশাখীর সামনে একের পর এক রাজ্য আর সেনাবাহিনীর উড়ে যাবার কাহিনী। কালাচাঁদ মুসলমান নাম নিয়েছিল মুহম্মদ ফরমুলি (ফরম আলি?)। কোথায় রইল মুহম্মদ আর কোথায় রইল ফরমুলি, আতংকিত ত্রাসিত জনগণের মুখে মুখে সে হয়ে গেল কালাপাহাড়। খবর পৌঁছে গেল ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে, দিল্লীতে, জোয়ানপুরে। বাংলায় জন্ম নিয়েছে বিজয়লক্ষ্মীর বরপুত্র। ছোট্ট সেনাদল নিয়ে সে সর্বগ্রাসী দাবানল সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। ছুটল জোয়ানপুরের দূত, ছুটলেন সৈয়দ। জোয়ানপুরের ওপর টেকা মেরে সে বরপুত্রকে বগলদাবা করে দিল্লীশ্বরের সামনে পেশ করলেন সৈয়দ।

পত্রপাঠ জোয়ানপুরের যুদ্ধের দায়িত্বভার। মানুষের বিশ্বাসের শক্তিকে আগেই অতিক্রম করেছিল কালাপাহাড়, এবার যেন মানুষের অবিশ্বাস করার শক্তিকেও অতিক্রম করে গেল সে। পত্রপাঠ চব্বিশ বছরের যুদ্ধের সমাপ্তি, জোয়ানপুরের পরাজয়! সমস্ত ভারত জুড়ে তখন একটাই নাম, কালাপাহাড়। বাংলার অলৌকিক, অপরাজেয় অদ্রভেদী কালাপাহাড়।

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সে। "জোয়ানপুর হইতে আসিবার মুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্তী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন".....। ফেরার পথে কাছেই পড়ল মন্দির নগর কাশী। আর যায় কোথায়! হিংস্র গর্জনে উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কালাপাহাড়ের বাহিনী। আবার সেই রক্তাক্ত পুরহুত-পাণ্ডা, ভগ্ন মন্দির, ভগ্ন মূর্তির কলংকিত অধ্যায়। আর তারপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই বিয়োগান্ত নাটক। স্বপ্ন নয়। গল্পও নয়। পাগলিনীর মত ছুটে আসছে স্থলিতবসনা স্ত্রীলোক। ভারত-ত্রাস মহাবিদ্রোহী কালাপাহাড় উঠে দাঁড়াল বিদ্যুতাহতের মত। পাগলের মত চিৎকার করে উঠতে চাইল, "মা- - সী " !!

আশৈশব বালকের সেই চিরনির্ভয় নির্ভর, সে আশ্রয় হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ল চোখের সামনে। হাতের বিষ ঢেলে দিল গলায়। কয়েকটা তীব্র মোচড় খেয়ে স্থির হয়ে গেল দেহ। আদরের রাজুর সৈন্যদের দ্বারা দলিত মথিত লাঞ্চিত অপমানিত আদরের মাসীর দেহ। দু'হাতে মুখ ঢাকা বিশাল কালাপাহাড়ের সমস্ত শরীর তখন যেন একের পর এক বিস্ফোরণের ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

মরণছোবলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত কালনাগ, তার মনিবের ওপরেই।

দিনান্তের প্রান্তে ধীরে নেমে এল অন্ধকার। নিস্তক্ক নিবুম রাত, নিস্পন্দ নীরব। বুকভাঙ্গা বেদনার্ট নাটকের যবনিকায় অশ্রুসিক্ত চোখে প্রহর গুনছে মহাকাল। সবরকম অত্যাচার বন্ধের আকস্মিক আদেশে বিস্মিত বিহ্বল গোটা সেনাবাহিনী। সবার অলক্ষ্যে নিশ্চুপে তাঁবু

থেকে বেরিয়ে গেল কেউ। আকাশ থেকে তারারা দেখল, সাগর গিরি অরণ্যানী সবাই দেখল, আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতবর্ষের বিসুয়, চির অপরাজিত তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সমরবিদ, রাজশাহীর মান্দা এলাকার ছেলেটা ভারসাম্যহীন উদ্ভ্রান্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছেঅন্ধকারেএকা.....গন্তব্যহীন.....

এরপর তাকে আর কখনো দেখনি কেউ, জীবিত বা মৃত।

(সূত্র: বৃহৎ বংগ, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন)

বর্গসফট ২০০০-এ পুনর্লিখিত।

২৩শে এপ্রিল, ৩০ মুক্তিসন।

২৩শে এপ্রিল ২০০২।